BL College Journal Volume -1, Issue-1, 2019
pp 12-22

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ : বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকি

ড. খ ম রেজাউল করিম
সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর, বাংলাদেশ
ই-মেইল : rezakarim.km@gmail.com
মহসিন মিঞা
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, খুলনা সরকারি কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইলঃ m.mia2705@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় দেশে কার্যকর তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে একদিকে পুরাতন সমস্যাগুলো যেমন-জটিলরূপ ধারণ করছে, তেমনি সময়ের পরিক্রমায় নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটছে।[১] বাংলাদেশে বর্তমানে এ রকম একটি আলোচিত সামাজিক সমস্যা হলো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ। রোহিঙ্গা সম্প্রদায় বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীগুলোর একটি। পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে সেনা অভিযানের প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত ৬,৪৭,৭০০ রোহিঙ্গা নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে।[২] মানবিক কারণে বাংলাদেশ সরকারও তাদের আশ্রয় দিয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত চার দশক ধরেই বাংলাদেশ প্রায় ৪ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভরণ-পোষণের দায়ভার বহন করছে।[৩] সব মিলিয়ে দেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া-টেকনাফ থানার ৩৪টি আশ্রয়শিবিরে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ-শিশু বসবাস করছে। শুরুতে তারা নিজ উদ্যোগে পাহাড় কেটে বসতি তৈরি করে। তবে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক মানুষের বসবাসের কারণে এ অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বাড়ছে দেশের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি। বর্তমান প্রবন্ধে মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশ কী ধরনের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকির মুখোমুখী হয়েছে এবং সমাজে তা কী ধরনের প্রভাব ফেলছে সে সম্বন্ধে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

২. রোহিঙ্গা কারা?

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বসবাসকারী একটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। রাখাইন রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশই রোহিঙ্গা। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্ভব বলে জানা যায়। রোহিঙ্গাদের নাম সম্পর্কে কথিত আছে সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া একটি জাহাজ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজন উপকূলে আশ্রয় নিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহর রহমে বেঁচে গেছি। এই

'রহম' থেকেই এসেছে রোহিঙ্গা। বস্তুত, রোহিঙ্গারা হলো আরাকানের তথা রাখাইনের ভূমিপুত্র।[৪] রোহিঙ্গাদেরকে বর্তমানে মিয়ানমার নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি না দিলেও তাঁদের ইতিহাস ১৭৯৯ সালে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন ফ্রান্সিস বুকানান নামক একজন স্কটিশ শল্যবিদ। তাঁর মতে, বার্মাতে তৎকালীন আরাকান সাম্রাজ্যে মোহাম্মদীন নামক মুসলিম গোষ্ঠী বহু আগে থেকেই বসবাস করতো 'রোয়িংগা' নামে।

৩. উদ্দেশ্য

যে কোনো প্রবন্ধের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। বর্তমান প্রবন্ধটিও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যগুলো হলো :

ক) রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ;
খ) বাংলাদেশের সমাজে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

৪. পদ্ধতি

এটি একটি উদঘাটনমূলক গবেষণা। বর্তমান প্রবন্ধে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য শুধুমাত্র দ্বৈতয়িক উৎসের সহায়তা নেয়া হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, স্বীকৃত জার্নাল, ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন (দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক কালেরকণ্ঠ, The Daily Star), বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, সেমিনার/ কনফারেন্স পেপার, সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্ট ও বিভিন্ন ওয়েব সাইটের সহায়তায় সংগৃহীত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বাছাই ও বিশ্লেষণ করে তা সরল সারণি ও বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. বিশ্লেষণ

৫.১ রোহিঙ্গা সমস্যার প্রেক্ষাপট

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ একটি বহুমাত্রিক ও বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চলেছে এর শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত।[৫] স্বাধীন রাজ্য আরাকানে ২০০ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকান তার স্বাধীনতা হারায়। বর্মি রাজা বোথাপোয়া আরাকান দখল করে অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করে। অতঃপর ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা বার্মা দখল করলে আরাকান বার্মার একটি প্রদেশ হিসেবে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে। বার্মায় ব্রিটিশ শাসনের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব অঙ্কুরিত হতে থাকে।[৬] স্বাধীনতার ডামাডোলের মধ্যেই ব্রিটিশ কলোনি বার্মার ৫ম প্রধানমন্ত্রী অং সানের হত্যাকাণ্ড ঘটে। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা লাভ করার পর অং সানকে স্বাধীন বার্মার জনক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় অং সানের অনুপস্থিতিতে। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। জান্তা সরকার ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার বাতিল করে দেয়। এই আইনে বার্মায় তিন ধরনের নাগরিকত্ব স্বীকার করা হয়। যথা- (১) যেসব জাতিসত্তা ১৮২৩ সালের আগে থেকে বার্মায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, সেই জাতিসত্তার সব মানুষ বার্মার পূর্ণ নাগরিক।

(২) যারা ১৮২৩ সালের পর বার্মায় এসেছে, কিন্তু ১৯৪৮ সালের সিটিজেন এ্যাক্ট অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ করেছে, তারা সহযোগী নাগরিক। (৩) যারা সহযোগী নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারেনি, তারা প্রকৃত নাগরিক। তবে নতুনভাবে আবেদন করে তারা অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত হতে পারবে। নাগরিকত্ব প্রদানের সব ক্ষমতা জান্তা সরকারের কাউন্সিল অব স্টেটসের কাছে দেওয়া হয়। কাউন্সিল অব স্টেটস এর গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮২৩ সালের পরে রোহিঙ্গাদের বার্মায় আগমন ঘটায় রোহিঙ্গা কোনো জাতিসত্তা নয়, তারা বার্মার নাগরিকও নয়। অথচ ১৯৫০-এর দশকেও রোহিঙ্গাদের বার্মার সংসদে প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং তারা উচ্চ পর্যায়ের সরকারি পদে বহাল ছিল।[৭] ২০১৭ সালের ৯ই অক্টোবর ৯ জন সীমান্তপ্রহরীর হত্যাকাণ্ডের পর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা মুসলমানদের সমষ্টিগতভাবে শাস্তি দিতে শুরু করে। এ সময় অসংখ্য রোহিঙ্গা শিশু-পুরুষ ও মহিলা হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের শিকার হয়। তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ এবং লুঠতরাজ চলে। এ অবস্থায় মিয়ানমারের প্রায় ৭ লক্ষ রোহিঙ্গা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়।[৮]

৫.২ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। জানা যায়, ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার সরকারের নির্মম হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সে সময় বাংলাদেশ সরকার মানবিক কারণে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকে স্বাগত জানায়। বিপন্ন মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়ে মুসলিম বিশ্বে নিজেদের একটি অবস্থান তৈরি করার উদ্দেশ্যে নেয়া তৎকালীন সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক বিবেচিত হয়নি। সেই ধারাবাহিকতায় অনুপ্রবেশের চাপ বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গার সংখ্যা ৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো বহু আগেই। এর সাথে ২০১৭ সালে অনুপ্রবেশ করেছে আরো ৭ লক্ষ ২৩ হাজার রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও শিশু। ইউএনএইচসিআর এর তথ্যমতে, সব মিলিয়ে বর্তমানে উখিয়া-টেকনাফের ৩৪টি আশ্রয়শিবিরে নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা ১১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯১৩ জন। এদের অধিকাংশই নারী (৫২%) ও শিশু (৫৫%)। তারা নিজ উদ্যোগে পাহাড় কেটে বাঁশ ও পলিথিন দ্বারা অপরিকল্পিতভাবে আবাস তৈরি শুরু করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তাদের বসতি তৈরি করা হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে ভাষাগত অনেকখানি মিল থাকার কারণে আস্তে আস্তে তারা মিশে যাচ্ছে স্থানীয় মূল জনগোষ্ঠীর সাথে।

৫.৩ নিরাপত্তা ঝুঁকির ক্ষেত্র ও সামাজিক প্রভাব

একটি মানবিক দেশ হিসেবে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে সারা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে মানবিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।[৯] যেমন–অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ঝুঁকি, খাদ্য সংকট, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি, শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা, পরিবেশ বিপর্যয়, মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, মানব পাচার প্রসার, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের বিস্তার ও মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও পাচার বৃদ্ধি, রোহিঙ্গাকেন্দ্রিক এনজিও কার্যক্রমের বিস্তৃতি, পতিতাবৃত্তির প্রসার, পর্যটন শিল্পে সংকট ইত্যাদি। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থানের ফলে প্রধানত তিন ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে।[১০] যথা: নিরাপত্তা ঝুঁকি,

সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যা। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিচে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে কক্সবাজার জেলায় আক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরা হলো

সারণি-১ : রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে আক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ

ক্রমিক নম্বর	আক্রান্ত ক্ষেত্র	শতকরা হার
০১	প্রাথমিক শিক্ষা খাত	৭৬.৭০%
০২	স্বাস্থ্য খাত	৩২.৪০%
০৩	কৃষি খাত	৭৮.০০%
০৪	পরিবেশগত খাত	৬১.০০%
০৫	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	৪৭.০০%
০৬	সার্বিক অর্থনীতি	৬৩.০০%
০৭	স্থানীয় জনগণ	৪৩.০০ %

সুত্র : এনজিও ফোরাম, কোস্ট ট্রাস্ট, দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ২৫ আগস্ট ২০১৮

সারণি-১ থেকে জানা যায়, দেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে কক্সবাজার জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ৭৬.৭ শতাংশ, স্বাস্থ্য খাতে ৩২.৪ শতাংশ, কৃষি ক্ষেত্রে ৭৮ শতাংশ, পরিবেশগত ক্ষেত্রে ৬১ শতাংশ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ৪৭ শতাংশ এবং সার্বিক অর্থনীতির ৬৩ শতাংশ ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নিয়ে স্থানীয় ৪৩ শতাংশ লোকজন আক্রান্ত হয়েছে।

৫.৩.১ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ঝুঁকি

রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। বিশেষ করে কক্সবাজার জেলার অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এ অঞ্চলের হাট-বাজারে ইতোমধ্যে মাছ, মাংস, চাল-ডাল থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি নিত্যপণ্যের বিক্রির পরিমাণ যেমন বেড়েছে, তেমনি দামও বেড়েছে কয়েক গুণ। ফলে স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সাধারণত শ্রমবাজার শ্রমিকের চাহিদা ও জোগানের মিথস্ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে শ্রমের ব্যাপক জোগানের কারণে শ্রমমূল্য কমে যাচ্ছে। রোহিঙ্গারা কৃষি জমিতে আশ্রয় নেবার কারণে কৃষি কাজ বন্ধ রয়েছে অনেকের। অর্থের অভাবে স্থানীয় শ্রমবাজারে সস্তায় কাজ করছেন রোহিঙ্গারা। ফলে স্থানীয় শ্রমবাজারে স্থানীয়দের আর কাজ জুটছে না। ফলে স্থানীয় শ্রমিক ও মজুররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আশপাশের লোকজনের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রতি ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছে, যা স্থানীয় শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

৫.৩.২ খাদ্য সংকট

দেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মারাত্মক খাদ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গার খাদ্যচাহিদা মেটানো দেশের জন্য একটা বড় চাপ। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে উচ্চমূল্যে খাদ্য আমদানি করতে হয়। যদিও রোহিঙ্গাদের

খাদ্য সরবরাহে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সহযোগী দেশ তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই সংকট দীর্ঘমেয়াদী হলে তাদের সাহায্যের হাত কতটা স্থায়ী হবে সেটাও বিবেচ্য বিষয়। যদি দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশকে নিজস্ব সামর্থে রোহিঙ্গাদের খাদ্য যোগান দিতে হয় তাহলে তা বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। ফলে অভ্যন্তরীণ খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ারও আশঙ্কা আছে। এছাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকা এবং এর সম্প্রসারিত এলাকায় স্থানীয় উৎপাদন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা স্থানীয় বাজারে খাদ্য যোগানে নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৫.৩.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকি

রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ন্যূনতম চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত ছিল। ফলে তাদের শরীরে নানা দুরারোগ্য ও সংক্রামক রোগ-ব্যাধি বাসা বেঁধে থাকতে পারে, যা এনজিও কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবক বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। আবার পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা ও সুপেয় পানির অপর্যাপ্ততার কারণে ক্যাম্প এলাকায় পানিবাহিত রোগ যেমন-ডায়রিয়া, কলেরা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ছে।[১১] এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, রোহিঙ্গাদের অনেকে যক্ষা, চর্মরোগ ও এইচআইভির জীবাণু বয়ে নিয়ে এসেছে। এসব রোগ বাংলাদেশীদের মধ্যেও সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে যে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ রয়েছে, তা বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। জানা যায়, টেকনাফ-উখিয়া এলাকার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এইডস এর প্রাদুর্ভাব বাড়ছে এবং তা শিবিরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছে। সম্প্রতি সনাক্ত হওয়া ৩৭৮ জন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ২৫৮ জন রোহিঙ্গা এবং ১২০ জন স্থানীয় জনগণ। যা এই অঞ্চলের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি ডেকে এনেছে এবং তা অচিরে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে যেতে পারে।

৫.৩.৪ শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা

শিক্ষা মানুষের জন্মগত, মৌলিক ও মানবিক অধিকার। এক প্রবন্ধে দেখা যায় বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের ৮০ শতাংশ অশিক্ষিত ও ৫৫ শতাংশই শিশু।[১২] দেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইউনিসেফ এর এক তথ্যমতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রায় ১,৪৫,০০০ শিশু ইউনিসেফ সহায়তাপুষ্ট নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা শুরু করেছে।[১৩] বর্তমানে কক্সবাজার অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থীই বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অর্থ প্রাপ্য সাপেক্ষে বা স্বেচ্ছাসেবার কাজে জড়িত। এ ধরনের আকস্মিক কর্মসংস্থানের সুযোগের ফলে গত বছর প্রায় ৪০% শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ে, যাদের অধিকাংশ রোহিঙ্গা বিষয়ক বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি এনজিওতে কাজ করছে।

৫.৩.৫ পরিবেশগত বিপর্যয়

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বাংলাদেশ পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের কারণে তা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে গিয়ে প্রায় ৪ হাজার একর পাহাড়ি এলাকা ইতোমধ্যে ধ্বংস করা হয়েছে এবং তাদের আবাসনের জন্য আরো প্রায় ১০ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ২ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বাড়তি

চাপ সামলানোর জন্য। ফলশ্রুতিতে এসব এলাকার পাহাড় ও বনভূমির প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাছাড়া রান্নার প্রয়োজনে বন ধ্বংস করা তাদের নিত্যদিনের কাজ। সব মিলিয়ে রোহিঙ্গাদের কর্মকাণ্ড দেশে মারাত্মকভাবে পরিবেশ ঝুঁকি তৈরি করছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রবল চাপ সামলাতে প্রতিদিন পাহাড় কেটে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে। এখানকার বৃক্ষরাজি প্রতিদিন উজাড় হচ্ছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। বিষয়গুলো এ অঞ্চলসহ দেশের প্রকৃতিতে বিপর্যয় ডেকে আনছে।[১৪] স্থানীয় পরিবেশবাদীদের হিসাবে, পাহাড়ের আশেপাশের জায়গা ধরলে রোহিঙ্গাদের বস্তির জায়গার পরিমাণ হবে প্রায় ১০ হাজার একর। এই বিপুল পরিমাণে পাহাড় কাটায় এলাকায় মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে যে কোনো সময় বড় রকমের পাহাড় ধসের আশঙ্কায় স্থানীয়রা উদ্বিগ্ন।[১৫] বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, সাড়ে ৪ হাজার একর পাহাড় কেটে রোহিঙ্গাদের জন্য বসতি স্থাপন করা হয়েছে। অনেক রোহিঙ্গাই তাদের ঝুপড়িঘরগুলো নিজেরাই তৈরি করেছে। ফলে এই এলাকায় ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটু ভারী বৃষ্টিপাত হলেই ধসে পড়তে পারে পাহাড়। এতে বহু মানুষ হতাহতের আশঙ্কাও করা হচ্ছে।

৫.৩.৬ মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তি

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক রোহিঙ্গা মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, এমনকি বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে দেশের বাইরে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা নারী ও পুরুষ বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয়পত্রের মালিক হয়েছে। পুলিশ ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সূত্র জানায়, রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট করিয়ে দিতে দেশব্যাপী একটি চক্র গড়ে উঠেছে। এই চক্রে পাসপোর্ট অফিসের কিছু কর্মচারী-কর্মকর্তা, দালাল ও পুলিশের মাঠপর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা আছে। তাঁরা জনপ্রতি ৩০-৩৫ হাজার টাকা নিয়ে রোহিঙ্গাদের হাতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ধরিয়ে দিচ্ছে। যদিও কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন শিবিরে থাকা নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের তথ্য নিয়ে সরকার ডেটাবেইস তৈরি করেছে।[১৬] তবে দীর্ঘদিন থাকার কারণে তারা স্থানীয় অসাধু চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়েছে এবং এদের সহযোগিতায় এক সময় ক্যাম্প ছেড়ে মূল জনস্রোতে মিশে যাচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যমতে, ইতোমধ্যে অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে জমিজমা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক বনে গেছেন। তাই প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা যদি দীর্ঘমেয়াদী শরণার্থী হয় তাহলে তাদের বিপুল সংখ্যায় জনস্রোতে মিশে যাবার আশঙ্কা থেকেই যায়। একই ইস্যুতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ৪০ হাজার রোহিঙ্গা। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে বিশেষ পরিচয়পত্রসহ আরো অনেক ব্যবস্থা। ফলে ভারতের মূল জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গাদের মিশে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৫.৩.৭ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারা দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। সমাজতত্ত্বের কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও দ্বন্দ্বের কারণে স্থানীয় জনগণের কাছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আচরণ বিচ্যুত, যা ভবিষ্যতে সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে বাড়ছে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। ইয়াবা, মানব পাচার ও হাটবাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোহিঙ্গা শিবিরের অভ্যন্তরে অন্তত ১৪টি রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে হামলা, সংঘর্ষের ঘটনা বাড়ছে। এক পরিসংখ্যানে

দেখা যায়, গত সাড়ে চার মাসে খুন হয়েছে ৩২ জন রোহিঙ্গা। অপহরণ, ধর্ষণসহ নানা অপরাধও বাড়ছে। জেলা পুলিশের তথ্যমতে, টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রোহিঙ্গাদের ১৪টি সংঘবদ্ধ দল রয়েছে, যারা শিবিরের অভ্যন্তরে অপরিকল্পিতভাবে দোকানপাট ও মাদক বিক্রির আখড়া তৈরি, মানব পাচার, অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়, ডাকাতি ও মাদকের টাকায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহসহ নানা অপরাধকর্ম করছে।[১৭] বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নানান ইস্যুতে বিশেষত আধিপত্য বিস্তারে আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের কিছু সংখ্যক বেপরোয়া সদস্য সিঁদেল চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই. মাদক ব্যবসা, বনভূমি দখলের মতো অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। এসব অপরাধকর্ম ধীরে ধীরে ক্যাম্পের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করতে হচ্ছে, যা বাংলাদেশের জন্য বাড়তি চাপ।

৫.৩.৮ মানব পাচার প্রসার

বাংলাদেশের মানব পাচার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আলোচিত বিষয়। সারাদেশ থেকে জোগাড় করা বিদেশ গমনেচ্ছুদের কক্সবাজারের টেকনাফ এলাকা দিয়ে নৌকা বা ট্রলারে করে মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। সম্প্রতি সেন্টমার্টিন উপকূলবর্তী সাগর থেকে একটি ট্রলারসহ মালয়েশিয়াগামী ৬০ (১১ জন শিশু, ২০ জন নারী ও ২৮ জন পুরুষ) জনকে উদ্ধার ও তাঁদের সাথে থাকা দুই দালালকে আটক করেছে কোস্টগার্ড।[১৮] এদের মধ্যে মাত্র ০১ জন টেকনাফের বাসিন্দা, আর বাকী ৫৯ জনই রোহিঙ্গা। জানা যায় এসব কাজের হোতা হিসেবে কাজ করছে রোহিঙ্গাদের একটি সংঘবদ্ধ চক্র। তারা অন্যদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের সহায়তায় একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এদের সাথে আছে স্থানীয় বাংলাদেশী দালালচক্র। এদের কার্যক্রম দেশের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। এক সূত্র মতে, আন্তর্জাতিক মানবপাচারচক্র রোহিঙ্গাদের দিকে শকুনের দৃষ্টি রাখছে। যেহেতু বেশির ভাগ রোহিঙ্গা পরিবারেই কোনো পুরুষ সদস্য নেই, অধিকাংশই নারী ও শিশু, সেহেতু পাচারচক্র তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের বিদেশে যৌনকর্মী এবং শিশুশ্রমিক হিসেবে পাচার করার চেষ্টা করছে।

৫.৩.৯ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের বিস্তার

দেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে কক্সবাজার সংলগ্ন এলাকায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রমের ব্যপ্তি চোখে পড়ছে। আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গাদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। এদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ আছে। সর্বশেষ তাদের আক্রমণের পাল্টা জবাব হিসেবে এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে বিতাড়ন করেছে মিয়ানমার। নির্যাতিত ও বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া এই রোহিঙ্গারা আবারো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠবে না এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সংগঠনটি বাংলাদেশের জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করতে পারে। অন্যদিকে, দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে দেশীয় জঙ্গি (জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, আনসারুল্লাহ) শক্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বক্তব্য। রোহিঙ্গাদের দলে ভেড়াতে পারলে তারা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। ফলে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা রাখাইন রাজ্য আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্যে পরিণত

হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য একটা বড় ধরনের হুমকি।

৫.৩.১০ মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও পাচার বৃদ্ধি

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পাশাপাশি দেশের এ অঞ্চলে বহুজাতিক নিরাপত্তা ঝুঁকিও রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্ট -এর মাঝামাঝি অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ মাদক পাচারের একটা আদর্শ রুট। একইভাবে এই অঞ্চল ক্ষুদ্রাস্ত্র পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চক্র প্রান্তিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মাদক ও ক্ষুদ্রাস্ত্র পাচারের বাহক হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে। আশঙ্কা রয়েছে স্থানীয় নতুন মাদকচক্র এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গড়ে ওঠার। এর ফলে মাদক ও অস্ত্র আরও সহজলভ্য হয়ে উঠবে, যা আন্তরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে ক্যাম্পে আশ্রিত পুরাতন রোহিঙ্গা ও স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীদের একটি চক্র মাদক আমদানি ও ব্যবসার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তারা মিয়ানমারের পুরাতন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এই ব্যবসায় নেমেছে। এক তথ্যমতে, ৩০টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৫০০ এর বেশি আখড়া পাওয়া গেছে এবং ১৩ জন রোহিঙ্গা নেতা ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত। ২০১৮ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক এবং বিভিন্ন থানায় ৭৯টি মাদক বিষয়ক মামলা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদকদ্রব্য বিষয়ক দ্বন্দ্বে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা খুন হয়েছে।[১৯] সম্প্রতি ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৯০০০ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুজন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে।[২০] দেশে মাদকঝুঁকি ভয়াল রূপের কারণে সরকার মাদক বিরোধী অভিযান চালু করতে বাধ্য হয়েছে। তবে বাংলাদেশী ভূখণ্ডে দীর্ঘমেয়াদে রোহিঙ্গাদের অবস্থান মাদক ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণের বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

৫.৩.১১ রোহিঙ্গাকেন্দ্রিক এনজিও কার্যক্রমের বিস্তৃতি

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়েছে নানা সংকট ও সমস্যা। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নে সেসব সমস্যা সমাধানে কাজ করে ছোট-বড়, সরকারি ও বেসরকারি অনেক সংস্থা। এক তথ্যমতে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৮৬টি জাতীয় এনজিও, ৩৬টি আন্তর্জাতিক এনজিও ও ১১টি জাতিসংঘ সংস্থা কাজ করছে। এদের মধ্যে জাতিসংঘ, জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা, আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা, ব্রাক, হোপ ফাউন্ডেশন, সিএসও, এনজিও ফোরাম, শেড, জাগো ফাউন্ডেশন অন্যতম। সম্প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সহযোগী দেশগুলো আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে রোহিঙ্গাদের প্রতি। ফলে এসব সংস্থাগুলো তাদের চলমান কর্মসূচি স্থগিত করে ক্ষেত্রবিশেষে বাতিল করে রোহিঙ্গা সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের বিশ্বাস এক্ষেত্রে কাজ করলে বেশি বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব। ফলে স্থানীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে এটা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব রাখছে।

৫.৩.১২ পতিতাবৃত্তির প্রসার

আগে থেকে আশ্রিত রোহিঙ্গা ও স্থানীয় দালালচক্র নতুন রোহিঙ্গা নারীদেরকে কাজের প্রয়োজনে ক্যাম্প থেকে বাইরে আনার চেষ্টা করছে। কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিশ্চুপ ভূমিকা গণমাধ্যমে

প্রকাশিত হচ্ছে। মূলত এসব নারীদের পতিতাবৃত্তি'র কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত হোটেল থেকে তিনজন রোহিঙ্গা নারীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পর্যটন এলাকায় এ ধরনের কর্মীর চাহিদাও স্বীকৃত। তাই ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গা নারীদের আর্থিক প্রলোভনে পড়াটা স্বাভাবিক। তবে পতিতাবৃত্তি আমাদের দেশে সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী কর্ম। তাই দেশের সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য বড় হুমকি তৈরি হচ্ছে।

৫.৩.১৩ পর্যটন শিল্পে সংকট

পর্যটন বাংলাদেশের অন্যতম লাভজনক খাত। দেশে প্রতিবছর বিদেশি পর্যটক আসার সংখ্যা দুই লক্ষের বেশি নয়। নিচে দেশে বছরওয়ারি বিদেশী পর্যটক আগমন সংখ্যা ও আয়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো–

সারণি-২ : দেশে বছরওয়ারি পর্যটক আগমন ও আয়ের পরিসংখ্যান (২০০৯-২০১৪)

ক্রমিক নম্বর	বছর	বিদেশী পর্যটক আগমন সংখ্যা	আয়ের পরিমাণ (কোটিতে)
০১	২০০৯	৫ লাখ ৮৮ হাজার ১৯৩ জন	-
০২	২০১১	২ লাখ ৭৮ হাজার ৭৮০ জন (১ম ৬ মাস)	-
০৩	২০১২	১ লাখ ২৪ হাজার ৯৪৩ জন	৮২৫.৪০
০৪	২০১৩	১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৪৯ জন	৯৪৯.৫০
০৫	২০১৪	১ লাখ ২৫ হাজার ৩৪ জন	১২২৭.৩০
০৬	২০১৫	৬ লাখ ৪৩ হাজার ৯৪ জন	১১৩৬.৯১
০৭	২০১৬	৬ লাখ ২০ হাজার জন	৮০৭.৩২

সূত্র : রূপময় বাংলাদেশ-২০১৮,২৩ দৈনিক প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশে বিদেশী পর্যটক আগমন নিয়ে ট্যুরিজম বোর্ডের দেয়া তথ্যমতে, ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দেশে বিদেশী পর্যটক বেড়েছে ৭০ হাজার ৭৪০ জন। অর্থাৎ প্রতিদিন পর্যটক আগমনের হার ১৯৩ জন। তবে ২০১৭ সালের শেষের দিকে ও ২০১৮ সালে দেশে বিদেশী পর্যটক আগমনের হার ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। কারণ হিসেবে জানা যায়, মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমণের কারণে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। রোহিঙ্গাদের জন্য কক্সবাজার ও পার্বত্যাঞ্চলে পর্যটন খাত ঝুঁকিতে পড়ছে এবং এসব এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদেশী পর্যটক কমে যাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ পর্যটকদের বিব্রত করার মতো অপরাধেও জড়িয়ে পড়ছে। অসংখ্য রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে ঢুকে পড়ায় কক্সবাজারসহ ওই এলাকার পর্যটন, অর্থনীতি ও পরিবেশ ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়েছে।

এছাড়া রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে কক্সবাজারসহ পার্শ্ববর্তী জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব পড়ছে। এ প্রভাব আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে দেশের সর্বক্ষেত্রে।

৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর নৃশংসতা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক সমালোচিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ

মহাসচিব রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অথবা অবাধে চলাচলের অধিকার, নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদানের জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ মহাসচিব ও বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রতি সহিংসতাকে গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করেছেন। মালদ্বীপ মিয়ানমারের সঙ্গে সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত করেছে। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের অং সান সু চির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই সংকট সমাধানে পাঁচ দফা প্রস্তাব দেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ সফরে এসে রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রস্তাব দিয়েছেন। অনেক দেশেই সাধারণ মানুষ এই বর্বরতার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমও বিষয়টিতে যথেষ্ট সোচ্চার হয়েছে। এদিকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে শুরু থেকেই মিয়ানমার এ সমস্যাটিকে দুই দেশের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছে। নানা কৌশলে বিষয়টি আন্তর্জাতিকীকরণ করতে দেয়নি মিয়ানমার। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা ইস্যুতে ১৯৭৮ সালে করা চুক্তিও মানেনি মিয়ানমার। ১৯৯২ সাল থেকে মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানে নানা তালবাহানা করে আসছে। সামগ্রিক অবস্থার বিবেচনায় সমস্যা সমাধান করতে হবে মিয়ানমারের অভ্যন্তর থেকে এবং এ ক্ষেত্রে দেশটিকে বাধ্য করতে পারে আন্তর্জাতিক মহল। আর বাংলাদেশ শুধু আবর্তিত হয়েছে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ঠেকানোর ব্যর্থ প্রয়াস এবং আশ্রয় দেওয়ার পাহাড়সম সমস্যার মধ্যে। নানা দিক বিবেচনা করে নিন্দা, উদ্বেগ জানানো আর দ্বিপাক্ষিক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিশ্ব শক্তিগুলোকে কাজে লাগানোর তাগিদ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। জাতিসংঘের তথ্যমতে, রোহিঙ্গারা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত ও রাষ্ট্রবিহীন জনগোষ্ঠী। তাই জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা নিয়ে তাদের প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে হবে। এ জন্য যত ধরনের কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন তা নিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সামরিক বাহিনীর বুদ্ধিতে রোহিঙ্গাদের নিয়ে মিয়ানমার সমস্যার যে বিষয়বস্তু তৈরি করেছে, তার সমাধান দেশটির অভ্যন্তর থেকেই করতে হবে। এক্ষেত্রে সামরিক অভিযান কাঙ্খিত ফল দেবে না। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা মোটেই বাংলাদেশের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। ফলে মিয়ানমারে চলমান জাতিগত ইস্যুতে রাষ্ট্রের বর্বরতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিয়ে যাওয়া দরকার। এজন্য প্রয়োজন অ্যাগ্রেসিভ ডিপ্লোমেসি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরো সক্রিয় হতে হবে। যুক্ত করতে হবে চীন ও ভারতকে। কারণ মিয়ানমারের ওপর এই দুটি দেশের বেশ প্রভাব রয়েছে। তবে মূল দায়িত্ব নিতে হবে জাতিসংঘকে, ভূমিকা রাখতে হবে নিরাপত্তা পরিষদকে।[২৪]

৭. উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে যা করছে, তাকে কোনো সভ্য দেশের আচরণ বলা যায় না। সেখানে যে ধরনের নৃশংসতা চালানো হয়েছে তাকে অনেক দেশ ও সংস্থা গণহত্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বমানবতার জন্যও তা এক চরম আঘাত। মানবিক কারণে বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। এখন দরকার তাদের বাসস্থানে ফেরত পাঠানো। বিশ্বনেতৃবৃন্দও এ বিষয়ে একমত। তাই বর্তমান বিশ্বজনমতকে কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গা

সংকট সমাধানে ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া দরকার। জাতিসংঘ, ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টি তুলে ধরা জরুরি। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতেও যাওয়া যেতে পারে এবং মিয়ানমারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা দরকার। আমরা আশাবাদী, বিশ্বনেতারা দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে স্বীকৃত নাগরিক হিসেবে ফেরার অধিকার দিতে মিয়ানমারকে বাধ্য করবেন ।

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

০১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা: স্বরূপ ও সমাধান, ঢাকা : উপমা প্রকাশন, জুলাই ২০০১, পৃষ্ঠা ১

০২. Jiji Paul, The Laments of Rohingya, Paper Presented in International Conference on Rohingya: Politics, Ethnic Cleansing and Uncertainty, Department of Criminology, University of Dhaka, September 1-2, 2008

০৩. আবুল কাশেম ফজলুল হক, 'রোহিঙ্গাদের নিয়ে কিছু মোটাদাগের কথা', দৈনিক কালেরকণ্ঠ (ঢাকা), ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৪

০৪. www.wikipedia.org/s/1293 accessed on 8 September 2017

০৫. আলম রায়হান, 'রোহিঙ্গা সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে', দৈনিক কালেরকণ্ঠ (ঢাকা), ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০

০৬. মো. জাকির হোসেন, 'মগের মুল্লুকে পদদলিত মানবতা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের করণীয়', দৈনিক কালেরকণ্ঠ (ঢাকা), ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ১১

০৭. Mowsume Bhattacharjee, Why are Rohingya as Stateless? Paper Presented in International, Conference on Rohingya: Politics, Ethnic Cleansing and Uncertainty, Department of Criminology, University of Dhaka, September 1-2, 2008

০৮. www.bbc.com/bangla accessed 8 on September 2017

০৯. কাজী বাকী বিল্লাহ বিকুল, 'রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ : আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের নিদারুণ হুমকি', দৈনিক ভোরের কাগজ (ঢাকা), ২১ অক্টোবর ২০১৭

১০. মিয়ানমারে বাংলাদেশের সাবেক ডিফেন্স এটাশে মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক এ কথা বলেন।

১১. অরুন কর্মকার, 'এইডস রোগী বাড়ছে সংক্রমণের আশঙ্কা', দৈনিক প্রথম আলো (ঢাকা), ২৭ আগস্ট ২০১৮

১২. Naznin Sabnam, Consequences of Rohingya Refugee in Bangladesh: Future Threat of Crime and Social Disorder, Paper Presented in International Conference on Rohingya : Politics, Ethnic Cleansing and Uncertainty, Department of Criminology, University of Dhaka, September 1-2, 2008

১৩. UNICEF Report, 24 January 2019

১৪. আ ন ম মুনীরুজ্জামান, 'নানা ঝুঁকির মধ্যে রোহিঙ্গা', দৈনিক প্রথম আলো (ঢাকা), ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

১৫. মিঠু মিয়া, 'রোহিঙ্গা সংকট : বাংলাদেশে পড়তে পারে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব', স্বদেশ খবর (ঢাকা), ২০১৯

১৬. কামরুল হাসান ও রোজিনা ইসলাম, 'রোহিঙ্গারা পাসপোর্ট কিনছে ৩০ হাজার টাকায়', দৈনিক প্রথম আলো (ঢাকা), ১৪ জুলাই ২০১৮

১৭. আব্দুল কুদ্দুস, 'কক্সবাজারের শিবিরে সক্রিয় ১৪ রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী', দৈনিক প্রথম আলো (ঢাকা), ৯ জুন ২০১৯

১৮. 62 Rohingyas recued in Cox'sbazar, 5 Traffickers held, The Daily Star (Dhaka), 16 June 2019

১৯. অরুন কর্মকার, আব্দুল কুদ্দুস ও গিয়াস উদ্দিন 'মাদকের ব্যাপক বিস্তার রোহিঙ্গা শিবিরে', দৈনিক প্রথম আলো (ঢাকা), ২৬ আগস্ট ২০১৮

২০. Rohingyas held with 9000 yaba tablets at Dhaka airport, The Daily Star (Dhaka), 16 June 2019

২১. Daily Dhaka Tribune (Dhaka), 14 January 2019

২২. এস এম নজিবুল্লাহ চৌধুরী, 'বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কত?' দৈনিক প্রথম আলো (ঢাকা), নভেম্বর ২০১৭

২৩. রূপময় বাংলাদেশ, বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬-২০১৭, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, আগস্ট-২০১৮

২৪. সম্পাদকীয়, দৈনিক কালেরকণ্ঠ (ঢাকা), ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা ১০